ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান

ইউনিট ৬

ভূমিকা

হিন্দুধর্মের মূল কথা হলো জগতের কল্যাণ সাধন এবং নিজের মুক্তি। জগতের কল্যাণ সাধন এবং নিজের মুক্তির জন্য কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান বা নিয়ম পালন করতে হয়। এগুলোই ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান। মূলত ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান একই সূত্রে গাঁথা। ধর্মাচার ব্যতীত যেমন ধর্মানুষ্ঠান হয় না তেমনি ধর্মানুষ্ঠান ব্যতীত ধর্মাচারও সার্থকতা লাভ করতে পারে না। একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংক্রান্তি, গৃহপ্রবেশ, রাখীবন্ধন, ভাইফোঁটা, দীপাবলি, হাতেখড়ি, নবান্ন প্রভৃতি হলো ধর্মাচার। আর দোলযাত্রা, রথযাত্রা, নামযজ্ঞ প্রভৃতি হলো ধর্মানুষ্ঠান।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৬.১ : ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান
পাঠ ৬.২ : ধর্মাচার (সংক্রান্তি, দীপাবলি, ভাইফোঁটা, হাতেখড়ি, বর্ষবরণ, নবান্ন, গৃহপ্রবেশ, রাখীবন্ধন)
পাঠ ৬.৩ : ধর্মানুষ্ঠান (রথযাত্রা, দোলযাত্রা, নামযজ্ঞ)
পাঠ ৬.৪ : পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব

পাঠ-৬.১ ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কতিপয় ধর্মাচারের নাম বলতে পারবেন।
- কতিপয় ধর্মানুষ্ঠানের নাম বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	মাঙ্গলিক ,লোকাচার, কল্যাণ, মুক্তি, প্রশংসা, নির্দেশ, সার্থকতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান :

ধর্ম মানে যা আমাদের ধারণ করে রাখে। হিন্দুধর্মের মূল কথা হলো জগতের কল্যাণ সাধন এবং নিজের মুক্তি। জগতের কল্যাণ সাধন এবং নিজের মুক্তির জন্য কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান বা নিয়ম পালন করতে হয়। হিন্দুধর্মে বেশ কিছু বিধি-বিধান রয়েছে যেগুলো মেনে চলতে হয়। ধর্ম পালন করতে হলে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান বা নিয়ম পালন করা হয় তাকে ধর্মাচার বলে। যুগ যুগ ধরে মানুষ ধর্মাচারের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে আসছে। এগুলো লোকাচারও বটে। তবে সকল আচরণে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ রয়েছে। মোটকথা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে, তা-ই ধর্মাচার। অপরদিকে ঈশ্বর, দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি, প্রশংসা করে যে সকল পূজা এবং অবশ্য কর্তব্য যে-সকল ধর্মানুষ্ঠান পালন করা হয় তা-ই ধর্মানুষ্ঠান। মূলত ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান একই সূত্রে গাঁথা। ধর্মাচার ব্যতীত যেমন ধর্মানুষ্ঠান হয় না তেমনি ধর্মানুষ্ঠান ব্যতীত ধর্মাচারও সার্থকতা লাভ করতে পারে না। সুতরাং ধর্মানুষ্ঠান করতে হলে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মাচার পালন করা অবশ্য কর্তব্য। সংক্রান্তি, গৃহপ্রবেশ, রাখীবন্ধন, ভাইফোঁটা, দীপাবলি, হাতেখড়ি, নবান্ন প্রভৃতি ধর্মাচারগুলোর পাশাপাশি দোলযাত্রা, রথযাত্রা, নামযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানগুলোও আমাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক। নিম্নে কয়েকটি ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হলো –

সারসংক্ষেপ :

ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান পরস্পর সম্পর্কিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে, তা-ই ধর্মাচার। অপরদিকে ঈশ্বর, দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি, প্রশংসা করে যে সকল পূজা এবং উৎসব পালন করা হয়, তা-ই ধর্মানুষ্ঠান।

পাঠ-৬.২ ধর্মাচার (সংক্রান্তি, দীপাবলি, ভাইফোঁটা, হাতেখড়ি, বর্ষবরণ, নবান্ন, গৃহপ্রবেশ, রাখীবন্ধন)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধর্মাচার কী তা বলতে পারবেন।
- সংক্রান্তি কী তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।
- দীপাবলি কী তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।
- ভাইফোঁটার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।
- হাতেখড়ি কী তা বলতে পারবেন।
- বর্ষবরণের গুরুত্ব এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নবান্ন কী তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।
- গৃহপ্রবেশ কী তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।
- রাখীবন্ধনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	সংরক্ষিত , জামাইষষ্ঠী, নবান্ন, অম্বুবাচি, মূল্যবোধ, জাগ্রত, ব্রত, উপবাস, সার্কাস, পুতুলনাচ, দেওয়ালি, আতশবাজি, অমরত্ব, উদ্বুদ্ধ, রমণী, ভয়ঙ্কর, সর্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক, গ্লানি, হালখাতা, অনাবিল, ঐতিহ্য, অমরাবতী, পুনরুদ্ধার, শ্রদ্ধার্ঘ্য, আমিষ, বিভোর ইত্যাদি।

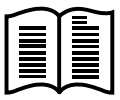

ধর্মাচার :

যে সমস্ড় মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে, সেগুলোই ধর্মাচার। এগুলো লোকাচারও বটে। ধর্মাচারগুলো ধর্মীয় বিধি-বিধান দ্বারা সংরক্ষিত। সংক্রান্তি উৎসব, গৃহপ্রবেশ, রাখীবন্ধন, দীপাবলি, ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী, হাতেখড়ি, বর্ষবরণ, নবান্ন, অম্বুবাচি প্রভৃতি হলো ধর্মাচার। ধর্মাচারগুলো মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে তোলে । সকলে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সংক্রান্তি :

সংক্রান্তি প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব। সাধারণভাবে বাংলা মাসের শেষ দিনটিকে বলা হয় সংক্রান্তি। শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে এই দিনে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মকে পুণ্যজনক বলে মনে করা হয়। তবে ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাসে সংক্রান্ড়ি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উৎসব পালন করা হয়। তবে পৌষ সংক্রান্তি ও চৈত্র সংক্রান্ড়ির উৎসবই বাঙালি সমাজে বেশি জনপ্রিয়। সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও 'সাকরাইন' নামে পরিচিত। তবে পৌষপার্বণ বা পৌষসংক্রান্তিকে মকরসংক্রান্তিও বলা হয়। হিন্দুরা এই দিনে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির প্রধান উৎসব শিব পূজা। এর অপর নাম নীলপূজা। এই পূজার একটি অঙ্গ চড়কপূজা। গোটা চৈত্রমাস জুড়ে উপবাস, ভিক্ষান্নভোজন প্রভৃতি নিয়ম পালন করার পর সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীরা কিংবা সাধারণ লোকেরা শূলফোঁড়া, বাণফোঁড়া ও বড়শিগাঁথা অবস্থায় চড়কগাছে ঘোরা, আগুনে হাঁটা প্রভৃতি সব ভয়ঙ্কর ও কষ্টসাধ্য দৈহিক কলা-কৌশল প্রদর্শন করে থাকে। তবে বর্তমানে এ ধরনের খেলা অনেক কমে এসেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই চৈত্রসংক্রান্তির মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাতে বাঁশ, বেত, মাটি ও ধাতুর তৈরি বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র পাওয়া যায়। এছাড়া সকল শ্রেণির মানুষের জন্যে বায়োস্কোপ, সার্কাস, পুতুলনাচ, ঘুড়ি ওড়ানো ইত্যাদি চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে থাকে। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন মেলায় এসে সমাগম হয়। চারিদিকে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

দীপাবলি :

হিন্দুদের সবচেয়ে বড় আলোর উৎসব হলো দীপাবলি। কার্তিক মাসে শ্যামা বা কালীপূজার আগের দিন অর্থাৎ অমাবস্যা তিথিতে এই দীপাবলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের তাৎপর্য হলো প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা অর্থাৎ সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করা। মোটকথা প্রদীপের আগুনে সকল কুসংস্কারকে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারা ব্রহ্মান্ড যেন আলোকিত হয়, এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়। এটি দেওয়ালি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

তবে অঞ্চলভেদে অর্থাৎ ভারতে এই ধর্মানুষ্ঠান সাধারণত পাঁচদিনব্যাপী প্রসারিত হয়। দীপাবলি উপলক্ষে বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে ঘর সাজানো হয়। সকলে নতুন বা পবিত্র কাপড় পরিধান করে ঘরে-বাইরে সর্বত্র মাটির প্রদীপ বা মোমবাতি সারি সারি সাজিয়ে দেন। এছাড়াও তারা বিভিন্ন রকম আতশবাজি ফুটিয়ে আনন্দে মেতে উঠেন। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা ছাড়াও জৈন ও শিখরা এই উৎসব পালন করে থাকেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা :

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা উৎসবটি কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পালন করা হয়। পুরাণে উল্লেখ আছে – কোনো এক কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনাদেবী তাঁর ভাই যমের কল্যাণ কামনায় পূজা করেন। তাঁরই পুণ্য প্রভাবে যমদেব অমরত্ব লাভ করেন। যমুনাদেবীর পূজার ফলে ভাই যমের এই অমরত্বলাভের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে হিন্দু রমণীরাও ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় এ উৎসব পালন করে থাকে। ভাইকে যাতে কোনো বিপদ-আপদ স্পর্শ করতে না পারে সেজন্য বোনেরা উপবাস থেকে কার্তিক মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে ভাইয়ের কপালে বাঁ হাতের কড়ে অথবা অনামিকা আঙ্গুল দিয়ে চন্দনের (ঘি, কাজল বা দইও হতে পারে) ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে। ফোঁটা দেওয়ার সময় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে বলা হয় –

ছবি : ভাই ফোঁটা

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
আবার
দ্বিতীয়াতে দিয়া ফোঁটা
তৃতীয়াতে দিয়া নীতা
আজ বুঝি আমার ভাইয়ের
যম দুয়ারে কাঁটা।

এ থেকে এই উৎসবের নাম হয়েছে ভাইফোঁটা। এ উৎসব উপলক্ষে বোন ভাইকে নতুন জামা-কাপড় বা অন্যান্য সামগ্রী উপহার হিসেবে দেয় আবার ভাইও বোনকে নানা সামগ্রী বা জামা-কাপড় উপহার হিসেবে দেয়। এদিন বাড়িতে আত্মীয়-

স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে বিশেষ খাবার-দাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়। মোটকথা, এই পবিত্র উৎসবের মাধ্যমে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়।

হাতেখড়ি :

হাতেখড়ি অনুষ্ঠানটি মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে অর্থাৎ সরস্বতীপূজার দিন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নিজবাড়ি কিংবা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এটি সম্পন্ন হতে পারে অথবা সরস্বতী পূজামন্ডপেও এক সঙ্গে অনেক শিশুকে হাতেখড়ি দেওয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুর বিদ্যাচর্চা শুরু হয়। পুরোহিত কিংবা সম্মানিত গুরুজনের কাছে কলাপাতায় খাগ দিয়ে লিখে অথবা স্লেটে খড়িমাটি দিয়ে লিখে শিশুরা লেখাপড়ার জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করে। এজন্যই এ অনুষ্ঠানটির নাম হয়েছে হাতেখড়ি।

হাতেখড়ি অনুষ্ঠানটি সাধারণত শিশুর পাঁচ বছর বয়সের সময় করা হয়; তবে পরিবেশগত কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে এর আগেও করা যেতে পারে। এরপরই শুরু হয় শিশুর নিয়মিত বিদ্যাচর্চা অর্থাৎ গৃহশিক্ষকের কাছে অথবা স্কুলে তার নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মোটকথা এখনও হিন্দুসমাজে হাতেখড়ির এ অনুষ্ঠানটি গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়।

বর্ষবরণ :

বাংলা সনের প্রথম দিনটি আনন্দঘন পরিবেশে নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয়। এটি বাঙালির একটি সর্বজনীন লোকউৎসব। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্ড়ি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদ্‌যাপিত হয় নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষ পালনের সূচনা হয় মূলত মুগল সম্রাট আকবরের সময় থেকেই। নববর্ষের মূল আকর্ষণ হলো হালখাতা এবং পান্ড়া ভাত ও ইলিশ মাছ খাওয়া। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রারম্ভে তাদের পুরণো হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে ঐ দিন হিসাবের জন্যে নতুন খাতা খোলেন। এ উপলক্ষে তাঁরা নতুন-পুরাতন পাইকারদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি মুখ করান এবং নতুনভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করেন। এছাড়া ঘরে ঘরে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের আগমন ঘটে। এরা একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে দেন। এছাড়া উপহার দেওয়ার মাধ্যমেও নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় চলে।

নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে বৈশাখী মেলা। এই মেলা বাঙালিদের কাছে এক অনাবিল মিলন মেলায় পরিণত হয়। এ মেলা ধনী-গরীব সকলের কাছে অত্যন্ত আনন্দময় হয়ে থাকে। মেলা ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রা, পালাগান, কবিগান প্রভৃতি লোকসঙ্গীত এবং বাউল-মারফতি-মুর্শিদি-ভাটিয়ালি ইত্যাদি আঞ্চলিক গানও এই উৎসব উপলক্ষে পরিবেশন করা হয়।

বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' আনন্দমুখর পরিবেশে পালিত হয়। বৈসাবি হলো পাহাড়ীদের সবচেয়ে বড় উৎসব। নববর্ষ উপলক্ষে মারমা উপজাতীয়রা ঐতিহ্যবাহী ওয়াটার ফেস্টিবাল বা পানি খেলার আয়োজন করে।

নবান্ন :

'নব' ও 'অন্ন' এ দুটি শব্দ মিলে হয় নবান্ন। নবান্ন শব্দের অর্থ হলো নতুন ভাত। নবান্ন আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী শস্যভিত্তিক লোক উৎসব।

প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায় এই নবান্ন উৎসব পালন করে থাকে। হেমন্তে আমন ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ কিংবা মাঘ মাসে গৃহস্থরা এ উৎসব পালনে মেতে ওঠে। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হলো নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ করা। তারপর গৃহকর্তা ও তার পরিবারবর্গ দেবতা, অগ্নি, কাক, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়-স্বজনদের নিবেদন করে নতুন গুড়সহ নতুন অন্ন গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে পিঠা-পায়েসের আদান-প্রদান ও আত্মীয়-স্বজনের আগমনে প্রতিটি গৃহের পরিবেশ আনন্দময় হয়ে ওঠে। পাড়ায়-পাড়ায়, বাড়িতে-বাড়িতে কীর্তন, পালাগান ও জারিগানের আসর বসে। নবান্ন উৎসবের ছোঁয়ায় গ্রামের সর্বত্র প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

গৃহপ্রবেশ :

নবনির্মিত গৃহে প্রথম প্রবেশ করার সময় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়। এসময় নারায়ণ দেবতার পাশাপাশি বাস্তু বা ভূমি দেবতা এবং গৃহকর্তার অভীষ্ট দেবতা বা ঠাকুরের পূজা করা হয়ে থাকে। গৃহপ্রবেশের সময় গৃহকর্তা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেন এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী ভোজনের ব্যবস্থা করে থাকেন। গৃহপ্রবেশের দিন কিছু কিছু অঞ্চলে নিরামিষ ভোজন করানো হয় আবার কিছু কিছু অঞ্চলে আমিষ ভোজন করানো হয়। এছাড়া গৃহকর্তা পুরোহিত, গুরুজন ও

আত্মীয়-স্বজনদের শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ বস্ত্র দিয়ে থাকেন। মোটকথা, গৃহপ্রবেশের সমস্ত দিন গৃহকর্তা আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠেন এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের কাছে প্রার্থনা জানান যেন সকলকে নিয়ে তিনি সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন।

রাখীবন্ধন :

হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। 'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসবটি পালিত হয় বিধায় এ দিনটি রাখী পূর্ণিমা নামেও পরিচিত। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতের কব্জির ওপরে একটি পবিত্র সুতার গিঁট বেঁধে দেন। এই সুতাটি ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে। এই উৎসব উপলক্ষে ভাই তার বোনকে বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকেন। হিন্দুধর্মাবলম্বী ছাড়াও জৈন ও শিখরা রাখীবন্ধন উৎসবটি মহাধুমধামে পালন করে থাকে।

'রাখীবন্ধন' সম্বন্ধে বৈবস্বত পুরাণে উল্লেখ আছে, দেবতা ইন্দ্র একবার রাজা বালীর সাথে যুদ্ধ করে হেরে যান। ইন্দ্র পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে পুনরায় যুদ্ধ করার মনস্থ করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। তখন শচীদেবী ইন্দ্রের হাতে তুলা সুতার দ্বারা বানানো একটি রক্ষা গিঁট বেঁধে দিলেন। এরপর ইন্দ্র যুদ্ধে বিজয় অর্জন করে অমরাবতী পুনরুদ্ধার করেন। সম্ভবত তখন থেকেই রাখীবন্ধন প্রচলিত হয়ে আসছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	• হাতেখড়ি কখন এবং কেন দেওয়া হয় এ বিষয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিন। • রাখীবন্ধন উৎসবটি কী তা বলুন।

সারসংক্ষেপ :

আমাদের জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করার জন্য যে সমস্ত আচার-আচরণ তা-ই ধর্মাচার। এগুলো লোকাচারও বটে। ধর্মাচারগুলো আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এসকল আচার-আচরণে শুভ ও মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ আছে।

বাংলা মাসের শেষ দিনটিকে সংক্রান্তি বলা হয়।

কার্তিক মাসে শ্যামা বা কালীপূজার আগের দিন অর্থাৎ অমাবস্যা তিথিতে এই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়ে থাকে ।

কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বোনেরা উপবাস থেকে বাঁ হাতের কড়ে অথবা অনামিকা আঙ্গুল দিয়ে চন্দন, ঘি, কাজল দিয়ে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে।

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে অর্থাৎ সরস্বতীপূজার দিন হাতেখড়ি অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুর বিদ্যাচর্চা শুরু হয়।

বর্ষবরণ বাঙালির একটি সর্বজনীন লোকউৎসব। বাংলা সনের প্রথম দিনটি বর্ষবরণ উৎসব হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

নবান্ন আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী শস্যভিত্তিক লোক উৎসব। হেমন্তে আমন ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ কিংবা মাঘ মাসে গৃহস্থরা নতুন ধানের চাল দিয়ে ভাত, নানা রকম পিঠা তৈরি করে এ উৎসব পালন করে থাকে।

নবনির্মিত গৃহে প্রথম প্রবেশ করার সময় গৃহকর্তা নারায়ণ দেবতার পাশাপাশি বাস্তু বা ভূমি দেবতার পূজা করে থাকেন।

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাখীবন্ধন উৎসবটি পালন করা হয়।

পাঠ-৬.৩ ধর্মানুষ্ঠান (রথযাত্রা, দোলযাত্রা, নামযজ্ঞ)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধর্মানুষ্ঠান কী তা বলতে পারবেন।
- প্রধান প্রধান ধর্মানুষ্ঠানের নাম বলতে পারবেন।
- রথযাত্রা সর্ম্পকে বলতে পারবেন।
- কখন রথযাত্রা শুরু এবং শেষ হয় তা বলতে পারবেন।
- দোলযাত্রা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দোলযাত্রা মূলত কাদের উৎসব তা বলতে পারবেন।
- নামযজ্ঞ কী তা বলতে পারবেন।
- নামযজ্ঞে কার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয় তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	স্তব-স্তুতি, ঈশ্বর, কর্তব্য, ধর্মশাস্ত্র, প্রশংসা, অধীশ্বর, প্রত্যাবর্তন, একাদশী, কৃপা, ত্রিতল, উড়িষ্যা, মন্দির, রথযাত্রা, পুরীধাম, সমাগম, অঞ্চল, হোলি, আবির, আশীর্বাদ, বৃন্দাবন, পূর্ণিমা, উল্লাস, উদ্‌যাপিত, বিভেদ, শ্রদ্ধা, একাত্ম, আয়োজন, সাড়ম্বর, প্রবর্তন, কীর্তন, মাহাত্ম্য, প্রহর, পরিত্রাণ, শ্রবণ, সম্প্রীতি, কুঞ্জ, দ্বেষ, বিমোহিত ইত্যাদি।

ধর্মানুষ্ঠান :

ইহকালের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে মানুষ পূজা এবং অবশ্যকর্তব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে। সুতরাং ঈশ্বর, দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি ও প্রশংসা করে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়, তাই ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মানুষ্ঠান করতে হলে ধর্মাচার পালন করা অবশ্যকর্তব্য। ধর্মানুষ্ঠানগুলো হলো রথযাত্রা, দোলযাত্রা, নামযজ্ঞ প্রভৃতি।

রথযাত্রা :

হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম। বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন দেব-দেবীর রথযাত্রার উল্লেখ রয়েছে। যেমন – ভবিষ্যপুরাণে সূর্যদেবের রথযাত্রা, দেবীপুরাণে মহাদেবীর রথযাত্রা, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও ভবিষ্যোত্তরপুরাণে বিষ্ণুর রথযাত্রা বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর রথযাত্রা হয়ে থাকে। কোথাও বৈশাখ মাসে, কোথাও আষাঢ় মাসে আবার কোথাও কার্তিক মাসে রথযাত্রার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। উড়িষ্যার পুরীধামে অনুষ্ঠিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত। এই রথযাত্রা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা নামে পরিচিত। জগতের নাথ বা অধীশ্বর যিনি তিনি-ই জগন্নাথ। তাই মুক্তিকামী মানুষ তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতেই রথযাত্রার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এই রথযাত্রা আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে শুরু হয় আর একাদশী তিথিতে প্রত্যাবর্তন বা ফিরতি রথ হয়। অর্থাৎ প্রথম দিন যেখান থেকে রথটি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, আটদিন পর অর্থাৎ একাদশীর দিন সেই স্থানেই আবার ফিরিয়ে আনা হয়।

ছবি : রথযাত্রা

একেই বলে উলটোরথ। রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা –এই তিনজন দেবতাকে রথে অধিষ্ঠিত করা হয়। ভক্তগণ এই তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দিরে নিয়ে রাখেন।

বহুকাল পূর্বথেকেই বাংলাদেশে এই রথযাত্রা উপলক্ষে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই এই রথযাত্রা মহাসাড়ম্বরে পালিত হয়। তবে ঢাকা জেলার ধামরাই অঞ্চলে যশোমাধবের রথযাত্রা খুব প্রসিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাটুরিয়া বালিয়াটির জমিদাররা ৬০ ফুট উঁচু ত্রিতল বিশিষ্ট রথটি নির্মাণ করেছিলেন। এই রথটি টানতে ২৭ মন শনের দড়ি ব্যবহৃত হতো। এখানে রথযাত্রা উপলক্ষে মাসব্যাপী মেলা হয়। সমগ্র দেশ, এমন কি ভারত-নেপাল থেকেও দড়ি টানার জন্য এখানে ভক্তদের সমাগম ঘটে। মোটকথা রথযাত্রা উপলক্ষে সকলের মনের মধ্যে আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

দোলযাত্রা :

হিন্দুদের একটি অন্যতম ধর্মীয় উৎসব হলো দোলযাত্রা। এটি দোল নামেও পরিচিত। উত্তর ভারতে এর নাম হোলি। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে পরের দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবির, কুঙ্কুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। পূজা শেষে পরস্পর পরস্পরকে রং বা আবির মাখিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে।

ছবি : আবির

বাংলাদেশসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সাড়ম্বরে এই দোলযাত্রা উদ্‌যাপিত হয়। এই দিন নারী-পুরুষ, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলে বিভেদ ভুলে রং খেলায় মেতে ওঠে। সকলেই একাত্ম হয়ে যায়। বিশেষ করে ঐদিন তরুণরা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রং খেলে। তরুণরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বয়স্কদের রং দেন এবং তাঁরাও ছোটদের আশীর্বাদ করেন। সেই সঙ্গে প্রত্যেক বাড়ি থেকেই সাধ্যমতো তরুণদের হাতে টাকা-পয়সা বা ধান-চাল দেওয়া হয়। তা দিয়ে সকলে মিষ্টিমুখ করে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে।

দোলযাত্রা মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এই দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবির নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীদের সাথে খেলায় মেতেছিলেন। সেই ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন হয়েছে। দোলযাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে গান, কৃষ্ণলীলা, রামলীলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়।

নামযজ্ঞ :

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্য মহাপ্রভুর নামযজ্ঞ অর্থাৎ নামকীর্তন করা হয়। এক এক জন এক এক সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম প্রচার অর্থাৎ কীর্তন করে থাকেন। মাঝে মাঝে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তবে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। মন্দির বা যেস্থানে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানটি করা হয় সে স্থানটি পবিত্র রাখা হয় এবং সুন্দর করে কুঞ্জ বানানো হয় যেন ঘুরে ঘুরে নাম কীর্তন করতে পারা যায়। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে সমবেত হন কারণ তারা বিশ্বাস করেন শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করলে সমস্ড় পাপ ক্ষয় হয়, সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং জীবন পূর্ণতায় ভরে ওঠে। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহুদূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে আসে এবং ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। সকলে হিংসা-দ্বেষ ভুলে একাত্ম হয়ে কৃষ্ণনাম শ্রবণে বিমোহিত হয়ে পড়ে। তাই এসকল ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

সারসংক্ষেপ :

ঈশ্বর, দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি ও প্রশংসা করে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়, তাই ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মানুষ্ঠানগুলো হলো রথযাত্রা, দোলযাত্রা, নামযজ্ঞ প্রভৃতি।

রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। এখানে তিনজন দেবতাকে অধিষ্ঠিত করা হয় – জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভক্তগণ এই তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে নিয়ে যান। আটদিন পর অর্থাৎ একাদশীর দিন ভক্তগণ সেই স্থানেই আবার রথটি ফিরিয়ে আনেন।

দোলযাত্রা হিন্দুদের একটি অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। উত্তর ভারতে এর নাম হোলি। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে পরের দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবির, কুঙ্কুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম কীর্তন করাকে নামযজ্ঞ বলে। এক এক জন এক এক সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম প্রচার অর্থাৎ কীর্তন করে থাকেন। মাঝে মাঝে নামযজ্ঞে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তবে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। মন্দির বা যেস্থানে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানটি করা হয় সে স্থানটি পবিত্র রাখা হয় এবং সুন্দর করে কুঞ্জ বানানো হয় যেন ঘুরে ঘুরে নাম কীর্তন করতে পারা যায়।

পাঠ-৬.৪ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	সৌহার্দ্য, বিনয়ী, সুদৃঢ়, বন্ধন, একত্রিত, উৎসবমুখর, ফলপ্রসূ, অনুসরণ ইত্যাদি।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব :

আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলার জন্য ধর্মাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মাচার মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে গড়ে তোলে। ধর্মাচারের মাধ্যমেই মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। অন্যদিকে ধমানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মাচার তেমন ফলপ্রসূ হয় না। ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। ধর্মানুষ্ঠানের ফলে সকলে হিংসা-দ্বেষ ভুলে একত্রিত হয় এবং একে অপরের সাথে সৌহার্দ্য গড়ে তোলে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে এই ধর্মানুষ্ঠান। সুতরাং আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবন সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের রীতিনীতি অনুসরণ করা অবশ্যকর্তব্য এবং দায়িত্ব।

সারসংক্ষেপ :

ধর্মাচারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মাচার মানুষকে ভদ্র ,নম্র ও বিনয়ী করে গড়ে তোলে। অন্যদিকে ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এই ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলে হিংসা-দ্বেষ ভুলে একত্রিত হয়, এর ফলে একটি উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট : ৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. হিন্দুদের কোন উৎসবটি আলোর উৎসব নামে পরিচিত ?
(ক) ভাইফোঁটা (খ) রাখীবন্ধন
(গ) দীপাবলি (ঘ) দোলযাত্রা

২. কোন মুগল সম্রাটের সময় থেকে বাংলা নববর্ষ পালনের সূচনা হয় ?
(ক) আকবর (খ) শাহ্জাহান
(গ) হুমায়ুন (ঘ) জাহাঙ্গীর

৩. রথযাত্রা উৎসবে কোন দেবতাদের নিয়ে ঘোরানো হয় ?
(ক) দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী (খ) জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা
(গ) রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা (ঘ) কার্তিক, গণেশ ও শিব

৪. নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে –
(i) মানুষের মিলনমেলা ঘটে
(ii) সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়
(iii) সকল ভেদাভেদ ভুলে একাত্ম হয়ে যায়।

নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i , i i ও i i i

 # নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

দশম শ্রেণির ছাত্র দীপ্ত বাংলা সনের প্রথম দিনটি অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের সাথে উদ্যাপন করে। পহেলা বৈশাখের সকালে তারা পান্তাভাত ও ইলিশ মাছ খাওয়ার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে গ্রামের সকলের সাথে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে। তারা একে অপরকে উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। এছাড়া প্রতিটি গৃহে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের সমাগম ঘটে। তার কাছে এ আনন্দ উৎসব হলো মহামিলন মেলা।

৫. দীপ্ত গ্রামের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ?
(ক) গৃহপ্রবেশ (খ) নবান্ন
(গ) দোলযাত্রা (ঘ) বর্ষবরণ

৬. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উক্ত অনুষ্ঠানটি দীপ্ত-এর জীবনে এক মহামিলন মেলা। কারণ এ অনুষ্ঠানটি–
(i) বাঙালির একটি সর্বজনীন লোক উৎসব।
(ii) বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব।
(iii) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত।

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. 'নবান্ন উৎসব ঐতিহাসিক ও সর্বজনীন' – ব্যাখ্যা করুন।

২. হাতেখড়ি অনুষ্ঠানটি কখন এবং কী উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।

৩. রাখীবন্ধন ও ভাইফোঁটার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করুন।

৪. 'দোলযাত্রা হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব' – ব্যাখ্যা করুন।

বর্ণনামূলক প্রশ্নঃ

১. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বর্ষবরণ উৎসবের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

২. মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে ধর্মাচারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৩. 'নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়' – ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ ১

প্রতি বছর লাবণ্য কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস থেকে তার ভাই প্রীতমের কপালে ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে। ফোঁটা দেওয়ার সময় লাবণ্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, কোনো বিপদ-আপদ তার ভাইকে যেন স্পর্শ করতে না পারে। লাবণ্য ফোঁটা দেওয়ার সময় তার ভাইকে উপহার দিয়ে থাকে। তার ভাই প্রীতমও তাকে তার প্রিয় জিনিসটি উপহার হিসেবে দিয়ে থাকে।

ক. গৃহপ্রবেশের সময় প্রধানত কোন দেবতার পূজা করা হয়।

খ. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয় ?

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধর্মাচারটি লাবণ্য কীভাবে উদ্‌যাপন করছে, তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে লাবণ্যের পালনকৃত ধর্মাচারটির প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : ইউনিট-৬

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১. গ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. ঘ